

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বড় লজ্জার মাঝে আছি

ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে অবুঝ বলে মনে করে, তারা কিন্তু আসলে মোটেই অবুঝ নয়। তারা সবকিছু বোঝে; বড় মানুষের কূটচাল-কুবুদ্ধি আর কুযুক্তি তাদের ভেতরে নেই বলে তারা অনেক সময় অনেক বিষয় বড়দের থেকে ভালো করে বোঝে। ব্যাপারটি যে সত্যি সেটি কাউকে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কারণ সবাই এক সময় ছোট ছিল, তখন তাদের চারপাশে যেসব জিনিস ঘটেছে তারা সবাই সেগুলো বেশ ভালোমতোই বুঝেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ছোট মানুষ কিছু বুঝব না মনে করে বড় বড় মানুষের আমাদের সামনে অনেক অপকর্মও করেছে, আমরা সেগুলোও বুঝেছি। কিছু বলতে পারিনি বলে নিঃশব্দে দেখে গেছি, ছোট বুক থেকে ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

এখনো নিশ্চয়ই তা-ই হচ্ছে, দেশে লাখ লাখ ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে আমাদের দেখছে এবং তাদের ছোট বুক থেকে ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কেন ফেলবে না? এর মাঝে দেশ বন্যার পানিতে ডুবে যেতে শুরু করেছে। আমি আজ ঢাকা থেকে সিলেট এসেছি, রাস্তার দু পাশে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। ঘরবাড়ি ডুবে গেছে, পানি ভেঙে মানুষ ছোট্টাছুটি করছে। ক্যাম্পাসে এসে হতবাক হয়ে দেখি পুরো ক্যাম্পাস পানিতে ডুবে আছে। বিবিসির খবরে দেখেছি আসাম আর বিহারে ভয়ঙ্কর বন্যা নেমেছে, সেই পানি হু হু করে বাংলাদেশে ছুটে আসছে। আসাম আর বিহারের বানভাসি মানুষের জন্য তাদের দেশের সরকারের উদ্বিগ্নের শেষ নেই, নানা রকম আয়োজন, নানা রকম উদ্যোগ। আমাদের দেশের সরকার এখনো পুরোপুরি নির্বিকার। জাতীয় সংসদের আলোচনায় বন্যার গুরুত্ব নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই। খবরের কাগজে বন্যা নিয়ে নানা রকম খবর। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খবর বিএনপির এক নেতা বাঁধ কেটে বন্যার পানি ঢুকিয়ে বগুড়ার ধুনট অঞ্চলে শত শত গ্রাম ভাসিয়ে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা আছে, আমি বুঝিনি, বুঝতে চাইনি। আমার ধারণা, বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বুঝতে পারি বাংলাদেশে যারা এই দানবদের জন্ম দিয়েছেন, যারা লালন করছেন, নিশ্চয়ই তারা একদিন তাদের হাতেই নিশ্চিহ্ন হবেন।

বগুড়ার ধুনট অঞ্চলের কোনো এক গ্রামে যে শিশুটি গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে তার বাড়িঘর, আপনজন বন্যার পানির প্রবল তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক অনুভব করেছিল, যখন বুঝতে পেরেছিল কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নেতা তার স্বার্থের কোনো একটি জায়গা থেকে ইচ্ছে করে বন্যার পানি ঢুকিয়ে একটি অঞ্চল, জনপদ, ঘরবাড়ি, মানুষজনকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন সে

নিশ্চয়ই বুকের ভেতরে অবিশ্বাস্য এক ধরনের ঘৃণা অনুভব করেছে; আমাদের মতো বড় মানুষদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারা নিশ্চয়ই অবাক-বিস্ময়ে ভেবেছিল, 'কেমন করে এরা পারে?' সত্যিই তো-কেমন করে আমরা পারি? কেমন করে চোখের সামনে এটা ঘটতে দেখেও আমরা সহ্য করি।

বন্যার পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা এর মাঝে ডুবে গেছে, খবরের কাগজের ছবির প্রয়োজন নেই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ক্যাম্পাসের হাঁটু পানি ভেঙে আমি যখন ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছি, তখন দিশেহারা একজন মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বন্যার মানুষদের জন্য এখানে কোনো জায়গা করা হয়েছে?' আমি বললাম, 'আমি তো জানি না।'

মানুষটি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় জায়গা হয়েছে জানেন?' আমি অপরাধীর মতো বললাম যে, আমি জানি না। মানুষটি পানিতে ছপ ছপ করে হেঁটে আশ্রয়ের জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। সারা দেশে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করছে, আমি নিশ্চিত এর মাঝে নিশ্চয়ই কেউ কেউ হাত তুলে আরো দ্রুত আরো ভয়ঙ্কর আরো দীর্ঘস্থায়ী একটা বন্যার জন্য দোয়া করছেন। বন্যা হলেই ত্রাণ, ত্রাণ মানেই বিদেশী সাহায্য, বিদেশী সাহায্য মানেই চুরি, চুরি মানেই সম্পদ, সম্পদ মানেই ফাল্টু বাল্টু কাল্টু। ফাল্টু বাল্টু কাল্টু মানেই নির্বাচন। নির্বাচন মানেই মন্ত্রী-আর এই মন্ত্রীরাই কয়দিনের ভেতরেই হেলিকপ্টারে করে ত্রাণসামগ্রী দিতে যাবেন, ক্যামেরার সামনে কয়েক জনের হাতে কয়েক কেজি চাল তুলে দেবেন। ক্যামেরায় সেই দৃশ্য ধারণ করা হবে, টেলিভিশনে সেই ছবি দেখানো হবে, খবরের কাগজে সেই ছবি ছাপা হবে। মানুষের জন্য মমতাহীন সেই ছবিগুলোর মতো অশালীন, নির্মম এবং হৃদয়হীন নির্ধুর ছবি কি আর কিছু হতে পারে? শুধু ফাল্টু বাল্টু কাল্টুর জন্যই কি এই দেশ? তারা আর তাদের চাটুকাররা যা খুশি সেটা করে পার পেয়ে যাবেন, আর আমরা সবাই সেটা সহ্য করব?

২.

প্রবল বন্যার আশঙ্কায় যখন সারা দেশ রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে, তখন জাতীয় সংসদে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অন্য কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ২৫ মার্চ যদি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন কেমন করে? ছোট শিশুর উপযোগী একটা প্রশ্ন, কিন্তু এর মাঝে ছোট শিশুর সারল্যটা নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কেন ২৬ মার্চ সেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী জানেন না এটা হতে পারে না-প্রশ্নটি করা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে তিনি সেটা বিশ্বাস করেন না। মুক্তিযুদ্ধের দলিলে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে, তার সমর্থনে দেশের প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্যটি দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের এই দলিলগুলো প্রকাশিত হওয়ার

পর এর পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম আলোচনা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় কোন পক্ষকে সমর্থন করছেন সেটি এই বক্তব্য দিয়ে দেশের সবার সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে হাসান হাফিজুর রহমান এবং তার সুযোগ্য সহকর্মীদের সম্পাদনায় ১৫ খণ্ডের এই দলিলগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে ইতিহাসের বর্ণনা নেই, দলিলগুলো সংকলিত আছে, এই দলিলগুলোর ভেতরে যে তথ্য আছে সেই তথ্য থেকে ইতিহাসকে বের করে আনা সম্ভব। আমি আমার নিজের সংগ্রহে রাখার জন্য অনেক দিন থেকে এই গ্রন্থগুলোর পুনর্মুদ্রণের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই যখন সেই দলিলগুলো প্রকাশিত হয়েছে তখন আমার খুব আশাভঙ্গ হয়েছে। আমি ইচ্ছে করলেই এই গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করতে পারি, তৃতীয় খণ্ডের পরিবর্তিত পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি, আসল পৃষ্ঠাগুলো ফটোকপি করে এনে জুড়ে দিয়ে এটাকে তার অবিকৃতরূপে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমার সেটি করতে ইচ্ছে করছে না, মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান একটি বিষয়কে কিছু মতলববাজ মানুষ এই দলিলগুলো পুনর্মুদ্রণের সুযোগে গ্লানিময় করে ফেলেছে চিন্তা করেই আমার মনটি বিষিয়ে উঠছে। এই দলিলগুলো হাতে নিলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আনন্দ-উত্তেজনা-দেশপ্রেমের শিহরণের সেই স্মৃতির বদলে কিছু চাটুকার তাঁবেদারের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের কথা মনে পড়বে ভেবেই আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছি।

অনেকেই বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের এই দলিলগুলো পুনর্মুদ্রণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার দিন তারিখ ইত্যাদি নিয়ে 'বিতর্ক' শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সালের আগে যাদের জন্ম হয়নি বা তখন যাদের বোঝার বয়স হয়নি, খুব সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছু তারা জানে না। কিন্তু আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছি তারা মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেছি নিজের কানে শুনেছি। আমাদের ভেতরে অনেকেই আছেন যাদের বই পড়ে বা গবেষণা করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হয় না, আমরা যেটা বলি, যেটা লিখি সেটাই হচ্ছে ইতিহাস! কাজেই কেউ যদি আমাদের নিজের চোখে দেখা এবং নিজের কানে শোনা কোনো বিষয়কে পাল্টে দিয়ে অন্য কিছু বলে বসে, তখন আমরা জানি সেটা বিতর্ক নয়, সেটা মিথ্যাচার। আমাদের এই প্রজন্ম যখন মরে শেষ হয়ে যাবে, নিজের চোখে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে সে রকম একজন মানুষও যখন বেঁচে থাকবে না তখন ইতিহাসের কোনো পুরনো বিষয়কে তুলে এনে সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে খুব সহজেই বিতর্ক শুরু করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন যদি সেই চেষ্টা করে, সেটি বিতর্ক নয় সেটি মিথ্যাচার। যারা ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজেদের মতো সাজিয়ে নিতে চান তাদের আরো একটু ধৈর্য ধরতে হবে- মুক্তিযুদ্ধের এই প্রজন্মকে মরে শেষ হতে দিতে হবে, তার আগে নয়।

ইতিহাস বিকৃতির এই নতুন এবং অপ্রয়োজনীয় অধ্যায় নিয়ে আমার দুঃখ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। আমাদের দেশের নতুন প্রজন্ম, অসংখ্য কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী নিশ্চয়ই এখন এক ধরনের আহত বিস্ময় নিয়ে খবরের কাগজের দিকে চোখ বোলাচ্ছে। তারা তো জানে না কোনটা বিতর্ক এবং কোনটা মিথ্যাচার। তাদের যে যেটাই বলবে সেটাই তাদের শুনতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান বিষয় নিয়ে যখন এই নোংরা মিথ্যাচার শুরু হয়ে যায়, তখন এই নতুন প্রজন্ম নিশ্চয়ই দিশেহারা বোধ করে। আমার শুধু ভয় হয় যে, এই নতুন প্রজন্ম বুঝি বা এত বড় একটা মহান বিষয়কে নিয়ে তুচ্ছ বিতর্কের জন্ম হতে দেখে সেটাকে ভুল বুঝতে শুরু করে। তারা যদি এই মহান অধ্যায় থেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, অনুপ্রেরণা না পায় তখন কী হবে? আমি জানি অত্যন্ত সজ্ঞানে অত্যন্ত কৌশলে এটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই দেশে নতুন একটা প্রজন্ম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাদের কাছে আমাদের ত্যাগ, দেশপ্রেম, ভাষা, সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসাকে ধর্মীয় একটা উন্মাদনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। সেটা হবে বাংলা ভাইয়ের প্রজন্ম।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের বলতাম, দেখো এই দেশের সবচেয়ে মহান বিষয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা। যারা এই মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাসে কালিমা মাখাতে চাইছে তোমরা তাদের কথাকে বিশ্বাস করো না। তারা যে বিষয়টি নিয়ে তর্ক করতে চাইছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সেটি মূল বিষয় ছিল না, সেটি নিয়ে তখন কিন্তু কেউ মাথা ঘামায়নি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন বা পিলখানার বিডিআর (সে সময়কার ইপিআর) ক্যাম্পে আক্রমণ করেছিল তখন সেই পুলিশ আর বিডিআর কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করেনি, 'স্বাধীনতার কি ঘোষণা হয়েছে? আমরা কি এখন যুদ্ধ করব?' তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণার আগেই তারা যুদ্ধ করেছিলেন-তাহলে কি তারা দেশদ্রোহী? মার্চ মাসে সারা বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়েছিল সেটাও কি দেশদ্রোহিতা ছিল? স্বাধীনতার ঘোষণার আগেই এই দেশের হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা কি সবাই 'নিহত', নাকি তারা 'শহীদ'? যদি এমন হতো যে, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্যিই দেওয়া হলো, কিন্তু কেউ মুক্তিযুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল না তাহলে কি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম? কিংবা উল্টোটা যদি হতো, কেউ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে ভুলে গেল কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ফেলল, তখন কি আমরা বলতাম, 'থুকু, দেশ তো স্বাধীন হতে পারবে না- আমরা যে ঘোষণা দিইনি! এই দেশটা পাকিস্তানই থেকে যাবে!'

ব্যাপারটি তা নয়, সবাইকে বুঝতে হবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এই দেশের সব মানুষ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষা এত গভীর ছিল যে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী নারকীয় নৃশংসতায় (মতিউর রহমান নিজামীর দলবল নিয়ে) এই দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনো তারা আশাহত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়নি, দাঁতে দাঁত কামড়ে অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছে, হাতে অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এই গভীর আকাঙ্ক্ষাটির জন্ম দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এই রাষ্ট্রটির জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে নির্বাচনে প্রায় সব আসন পেয়ে এই দেশের মানুষের পক্ষে কথা বলার নৈতিক আর আইনগত অধিকারও ছিল শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যদি সজ্ঞানে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ না করে নিজের নামে ঘোষণা দিতেন দেশের মানুষ ধরে নিত যুদ্ধের উত্তেজনায় ভুল করে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা হয়নি! যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে, সেটাকেই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়েছে। ২৫ মার্চেই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে কিন্তু দেশের মানুষকে প্রথম প্রথম সেটা বলা হয়নি। দেশের আনাচে-কানাচে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু আছেন, তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন! যখন সত্যিই সবাই জেনে গেল বঙ্গবন্ধু নেই, তখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তার ভাষণই শোনানো হতো দেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। পাকিস্তানি মিলিটারির বন্দিশালায় থাকার পরও মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাকে তাকে ঘিরেই ছিল এই দেশের মানুষের কল্পনা। তিনি ফিরে এলে বাঙালির সব দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে এরকম একটা স্বপ্ন সবাই দেখেছিল-সেই স্বপ্ন সত্যি হয়নি বলে অন্য কেউ নয়-তাকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ঘটানোও সম্ভব হয়েছিল এই দেশের মাটিতেই।

১৯৭১ সালে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তার মতো বীরত্বের সঙ্গে আরো অনেকে যুদ্ধ করেছিলেন। অনেকে যুদ্ধে শহীদও হয়েছিলেন কিন্তু তাদের সবার নাম ছাপিয়ে আমরা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম শুনি তার কারণটি এই নয় যে, ২৭ মার্চ তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার কারণ তিনি বিএনপি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। সেই দলটি একা বা জোট করে নির্বাচনে জয়লাভ করে একাধিকবার এই দেশ শাসন করেছে। যদি তা না হতো তাহলে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইতিহাসে যেটুকু স্থান পাওয়ার কথা ঠিক ততটুকু স্থান পেতেন। তার থেকে বেশি তিনি পেতেন না, কিংবা তার থেকে বেশি তাকে দেওয়ার কেউ চেষ্টাও করত না। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে ছিলেন এবং চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটা বেতার কেন্দ্র ছিল- এই দুটি যোগাযোগের কারণে অন্য কেউ না হয়ে তিনিই সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমি নিজের কানে সেই ঘোষণাটি শুনেছিলাম, আমার

মতো আরো লাখ লাখ মানুষ সেই ঘোষণাটি শুনেছিল এবং শুনে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান না থেকে তখন সেখানে খালেদ মোশাররফ বা কর্নেল তাহের থাকতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আগ্রহের সঙ্গে সেই ঘোষণাটি দিতেন এবং তারাই এই ইতিহাসের অংশ হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই ইতিহাসের অংশ তারা হননি-হয়েছেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জেড ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, সেটি কিন্তু ঘটনাক্রমে হয়নি। সেটি হয়েছে তার শৌর্য-বীর্য-সাহস আর দেশপ্রেমের জন্য। ইতিহাসের গৌরবের সেই অংশটুকু ‘ঘটনাক্রমে’ তার হাতে চলে আসেনি, তিনি নিজে সেটা অর্জন করেছিলেন।

আজ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বেঁচে নেই। বেঁচে থাকতে তিনি নিজে যেটা দাবি করেননি, এখন তার দলের মানুষরা তার জন্য সেটা দাবি করছে। যারা দাবি করছেন তারা কেউ ইতিহাসবিদ নন, তাদের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, তারা চাটুকার। চাটুকারদের স্থান হয় ইতিহাসের আঁস্কা কুড়ে-তাদেরও সেই একই পরিণতি হবে-সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম ব্যবহার করে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তার ভূমিকাটাকেই প্রশংসিত করে তুলছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই পুরো ব্যাপারটিই কি বিষয়ে উঠছে না? এতে কার লাভ হচ্ছে? স্বাধীনতাবিরোধীদের-তারা মুচকি হেসে বলছে, ‘আমরা তো আগেই বলেছিলাম!’ মুক্তিযুদ্ধের একটা মন্ত্রণালয় খোলা হয়েছে দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত, সন্দেহজনক একটি বিষয় হিসেবে তুলে ধরার জন্য-এর চাইতে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে?

৩.

পণ করেছিলাম নোংরা বিষয় নিয়ে লিখব না, তারপর থেকে আবিষ্কার করেছি আমার লেখার কিছু নেই। কিন্তু পরের প্রজন্মের কাছে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। তাই এই দেশের কিছু নোংরা মানুষের নোংরা কাজ নিয়ে লিখতে হলো। আর কিছু না হোক, অন্তত নিজেকে বলতে পারব একটা মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলাম।

মহান মুক্তিযুদ্ধের তথ্য নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হচ্ছে, এর থেকে বড় দুঃখের ব্যাপার আর কী আছে? আমাদের দেশের শিশু-কিশোর-কিশোরীরা, তরুণ-তরুণীরা আহত বিস্ময় নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তা করে আমি আজ বড় লজ্জার মাঝে আছি।

২০ জুলাই, ২০০৪

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : লেখক। অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।